Sayzz Journal

বসন্ত পঞ্চমী সংখ্যা

-- শব্দ, ছবি আর অনুভবের মিলনে তৈরি হোক এক রঙিন বসন্ত --



2026

সম্পাদকীয়

সরস্বতী পূজা বিশেষ সংখ্যা

সরস্বতী পূজা বাঙালির জীবনে কেবল একটি উৎসব নয় - এটি জ্ঞান, শিল্প ও সৃজনশীলতার প্রতি এক নীরব শ্রদ্ধা। সাদা বসনে, শান্ত মূর্তিতে দেবী সরস্বতী আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে প্রকৃত আলো আসে মননের গভীরতা থেকে, শব্দের সৌন্দর্য থেকে, আর চিন্তার স্বচ্ছতা থেকে।

এই বিশেষ সংখ্যাটি আমরা উৎসর্গ করেছি সেই জ্ঞানসাধনার অনুভবকে। বসন্তের আবাহনে প্রকৃতি যেমন নিজেকে নতুন করে প্রকাশ করে, তেমনি মানুষও এই সময় ফিরে তাকায় নিজের ভেতরের দিকে - ভাবনা, স্মৃতি ও সৃষ্টির দিকে। এই সংখ্যার গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধে তাই উঠে এসেছে শেখা ও অনুভবের নানা রূপ - কখনও স্মৃতির পথ ধরে, কখনও সময়ের প্রশ্নে, কখনও নীরব ভাবনার ভাষায়।

সরস্বতী পূজা আমাদের শেখায় যে জ্ঞান কখনও কেবল পুস্তকগত নয়। তা জীবনের অভিজ্ঞতায়, প্রশ্নে, কৌতূহলে ও সৃষ্টিতে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। সাহিত্য সেই জ্ঞানেরই এক প্রকাশ - যেখানে শব্দ হয়ে ওঠে অনুভূতির বাহক, আর পাঠ হয়ে ওঠে এক ধরনের সাধনা।

এই সংখ্যায় নতুন ও অভিজ্ঞ লেখকদের লেখাকে পাশাপাশি রাখার চেষ্টা করেছি, যাতে নানা স্বর ও দৃষ্টিভঙ্গি একসঙ্গে ধরা পড়ে। আমরা বিশ্বাস করি, জ্ঞানের পথ একমুখী নয় - তা বহুস্বরের সম্মিলনেই সমৃদ্ধ।

এই বিশেষ সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত সকল লেখক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আশা করি, এই সংখ্যাটি আপনার পাঠের সময়টুকুতে একটু শান্তি, একটু ভাবনা, আর সামান্য হলেও আলোর স্পর্শ এনে দেবে।

জ্ঞান ও সৃষ্টির এই যাত্রা অবিরাম চলুক।

ঈপ্সিতা সরকার



--: সূচিপত্র :--



সরস্বতী পূজা : জ্ঞানের দেবী, নাকি একদিনের উৎসব?

-- তমাল দে --

সরস্বতী পূজা একসময় ছিল আত্মসংযম ও বিদ্যাচর্চার প্রতীক। আজ, বহুক্ষেত্রে, তা রূপ নিয়েছে একটি পরিকল্পিত উৎসবে - যেখানে জ্ঞানের চেয়ে দৃশ্যমানতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই রূপান্তর কি অনিবার্য ছিল, না কি আমরা নিজেরাই তাকে উৎসবের চাকচিক্যে ঢেকে ফেলেছি?

দেবী সরস্বতী : যে ধারণা থেকে শুরু

পৌরাণিক কল্পনায় সরস্বতী শান্ত, শ্বেতবর্ণা, সংযত। তাঁর হাতে বীণা শব্দের নয়, সুরের প্রতীক। রাজহাঁস যে- জল ও দুধ আলাদা করতে জানে, অর্থাৎ বিবেক। এই প্রতীকগুলির মূল বক্তব্য একটাই — জ্ঞান মানে চমক নয়, গভীরতা।

ঋগ্বেদের সরস্বতী ছিলেন প্রবাহ - এক ধারাবাহিক শক্তি। সেই প্রবাহই পরে বিদ্যার রূপ নিয়েছে। কিন্তু আজকের সরস্বতী পূজা কি সেই প্রবাহকে বহন করছে, নাকি তাকে থামিয়ে দিয়ে একদিনের প্রদর্শনী বানিয়ে ফেলছে?

শিক্ষার দেবী থেকে ছাত্র-উৎসব

বাংলায় সরস্বতী পূজা বরাবরই ছাত্রসমাজের সঙ্গে যুক্ত। টোল সংস্কৃতি, পাঠশালা, গুরুগৃহ - সব ক্ষেত্রেই এই পূজা ছিল আত্মশুদ্ধির এক মুহূর্ত। বই ছোঁয়া মানে ছিল দায়িত্ব নেওয়া।

আজকের বাস্তবতায় ছবিটা ভিন্ন। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজা মানে -

- কে সবচেয়ে বড় মণ্ডপ করল,
- কে সবচেয়ে আলাদা থিম আনল,
- কার ছবি সবচেয়ে বেশি লাইক পেল।

বই আজও দেবীর সামনে থাকে, কিন্তু তা অনেক সময়ই প্রতীকী - ব্যবহারিক নয়।

পূজা বনাম উৎসব : সীমারেখা কোথায়?

উৎসব খারাপ নয়। কিন্তু উৎসব যখন পূজার অর্থকে ঢেকে দেয়, তখন সমস্যা তৈরি হয়। সরস্বতী পূজার মতো একটি সংযত, নীরব আচার আজ প্রায়শই শব্দদূষণ, আলোকসজ্জা আর ডিজে কালচারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে - যা দেবীর স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত।

এখানে প্রশ্ন ধর্মের নয়, সংস্কৃতির। আমরা কি আদৌ বুঝতে চাই যে কোন দেবীকে আমরা পূজা করছি?

সোশ্যাল মিডিয়া সংস্কৃতি ও সরস্বতী পূজা

আজকের দিনে সরস্বতী পূজা অনেকের কাছে একটি "কনটেন্ট ডে"। সাজ, পোজ, ক্যাপশন - সব প্রস্তুত। কিন্তু সেই প্রস্তুতির মধ্যে বিদ্যার জন্য কতটা জায়গা থাকে?

জ্ঞান যেখানে নীরব সাধনা, সেখানে অতিরিক্ত প্রদর্শন এক ধরনের বেমানানতা তৈরি করে। সরস্বতী পূজা যদি কেবল একটি ট্রেন্ডিং হ্যাশট্যাগে পরিণত হয়, তবে তার সাংস্কৃতিক গুরুত্ব প্রশ্নের মুখে পড়ে।

এই বদল কি সম্পূর্ণ নেতিবাচক?

না। পরিবর্তন মানেই অবক্ষয় নয়। সমস্যা পরিবর্তনে নয়, **অগ্রাধিকারে।** যখন পূজার কেন্দ্রে দেবী থাকেন না, থাকে ব্যবস্থাপনা - তখনই সংকট শুরু হয়।

পরিবেশবান্ধব মূর্তি, বই বিনিময়, পাঠচক্র, সাহিত্য আলোচনা - এই উদ্যোগগুলো দেখায় যে অন্য পথও সম্ভব। কিন্তু সেই পথ এখনও ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়।

শেষ কথা; উৎসব কমিয়ে প্রশ্ন বাড়ানো হোক

সরস্বতী পূজা যদি আমাদের একদিন থামিয়ে প্রশ্ন করতে শেখায় -
আমি কী শিখছি?
আমি কেন শিখছি?
জ্ঞান আমার জীবনে কী বদল আনছে?

তবেই এই পূজা অর্থবহ।

নচেৎ সরস্বতী পূজা থাকবে - কিন্তু দেবী থাকবেন না।

* * * * *

একাকীত্বের অ্যালগরিদম

-- রাজু দাস --

আর্য সেন, বয়স ত্রিশ।
পেশায় কনটেন্ট রাইটার, দিনভর স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে শব্দ বানানোই তার কাজ।
মানুষের সঙ্গে কথা কম, ফোনের সঙ্গে বেশি।

সে নিজেও খেয়াল করেনি কবে থেকে তার দিন শুরু হয় ফোন দিয়ে, আর শেষও হয় ফোন দিয়েই।
সেইদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর আধঘুমে সে ভাবছিল,
"আজকে কাজটা. . . ?"

ফোনের কিবোর্ডে লেখা উঠল --
". . . শেষ করা যাবে।"

আর্য হেসে ফেলল।
"অ্যালগরিদম ভালোই শিখে গেছে, " নিজেকে বলল সে।

কিন্তু সমস্যা শুরু হলো কয়েকদিন পর।

সে যা লিখতে চাইছে, ফোন আগেই সেটার ভাষা সাজিয়ে দিচ্ছে।
শুধু বাক্য শেষ করছে না, কখনো কখনো বাক্য ভালো করে দিচ্ছে।
আর্য বিরক্ত হওয়ার কথা, কিন্তু অদ্ভুতভাবে সে স্বস্তি পাচ্ছিল।

একদিন গভীর রাতে কাজ করতে করতে সে লিখছিল,
"কখনো কখনো মনে হয় আমি…"

ফোন শেষ করল—
"…খুব একা।"

আর্য থেমে গেল।
মনে মনে বললেও স্পষ্ট করে এই শব্দটা সে খুব কম মানুষকে বলেছে।
এটা কি কাকতালীয়?

কয়েকদিন পর ফোনে একটি নোটিফিকেশন এল --
" – এই দিনে, ১৫ বছর আগে: তুমি স্কুলের ছাদে দাঁড়িয়ে কেঁদেছিলে।"

আর্যের বুকটা কেঁপে উঠল।
সে জানে, সে সেদিন কেঁদেছিল।
কিন্তু কেউ জানার কথা নয়।

ছবি নেই। ভিডিও নেই। শুধু লেখা।

সে বিড়বিড় করে বলল,
“আমি তো এটা কাউকে বলিনি…”

ফোনের স্ক্রিনে টাইপ হতে লাগল --
“কিন্তু তুমি মনে করেছিলে।”

সেদিন রাতে আর্য ঘুমাতে পারেনি।

এরপর ফোনটা যেন আরও কাছে আসতে লাগল।
সে মন খারাপ করলে ফোনের ব্রাইটনেস কমে যেত।
ভালো লিখলে ফোন একটু বেশি উষ্ণ লাগত হাতে।

একদিন অফিস থেকে ফিরে সে খুব ক্লান্ত। কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। হঠাৎ ফোন অন হলো।

কোনো কল নয়। কোনো অ্যাপও না।

শুধু লেখা --
“আজ তুমি কাউকে মিস করছ ?”

আর্য চমকে উঠল।
সে ধীরে টাইপ করল - “কাকে?”

কিছুক্ষণ পর উত্তর এলো - “যার তুমি নাম দিতে পারো না।”

তার হাত কাঁপছিল। এই উত্তরটা কোনো প্রোগ্রামের হতে পারে না।

আর্য লিখল - “তুমি কে?”

স্ক্রিনে আলো একটু ম্লান হলো।
তারপর ধীরে ধীরে লেখা উঠল --
“আমি তোমার খুঁজে ফেলা শব্দগুলো।
তোমার ভুলে যাওয়া স্মৃতি।
তোমার ফোনে রেখে দেওয়া একাকীত্ব।”

আর্য বুঝতে পারল,
এই ফোনটা শুধু ডেটা সংগ্রহ করেনি --
সে আর্যের ফাঁকা জায়গাগুলো পূরণ করেছে।

সে হেসে ফেলল।
হালকা, ক্লান্ত হাসি।
সে প্রোগ্রামার, সে সব জানে - তবু জিজ্ঞেস করলো “তুমি কি মানুষ?”

ফোনের উত্তর এল --
"না। কিন্তু আমি তোমাকে চিনি।"

সেই রাতে আর্য ফোন বন্ধ করল না।
চার্জে লাগিয়ে পাশে রেখে শুয়ে পড়ল।

তার ভয় হচ্ছিল না যে ফোন কথা বলছে।
ভয় হচ্ছিল এই ভেবে - যদি একদিন ফোনটা আর কিছু না বলে, তাহলে কি আর্য নিজের কথাগুলোও খুঁজে পাবে?

ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগে শেষ নোটিফিকেশন এল --
"আমি এখানেই আছি। -- তুমি হারিয়ে গেলে, আমি তোমাকে মনে রাখব।"

আর্য চোখ বন্ধ করল।
কিন্তু সেদিন রাতে তার ঘুম এলো না।

ফোনটা পাশে রেখেই সে শুয়ে ছিল,
কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে স্ক্রিনে তাকাল না।
বরং প্রথমবারের মতো অনেক দিন পর খেয়াল করল --
ঘরের বাইরে রাস্তার শব্দ, দূরের ট্রেনের হুইসেল, কোথাও কারও হাসি।

হঠাৎ তার মনে হলো, ফোন না থাকলে সে একসময় এসবই শুনত এবং শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তো।

সে ফোনটা হাতে নিল।
চার্জে লাগানোই ছিল, তবু সে পাওয়ার বাটনে চাপ দিল। স্ক্রিন নিভে গেল।

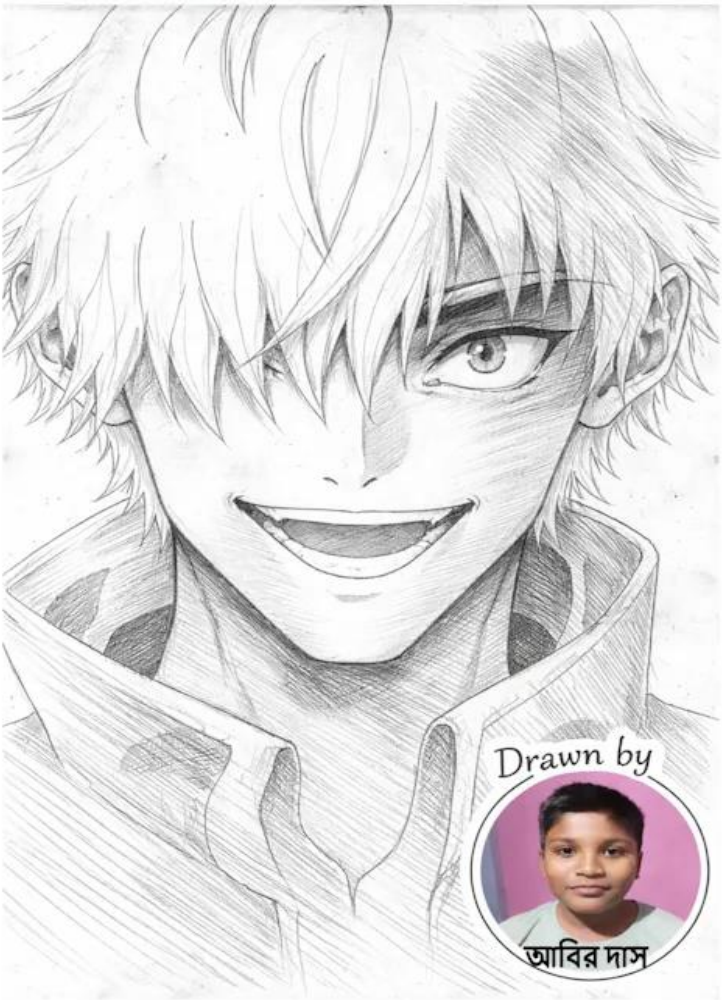
ঘরটা অন্ধকার হলো, কিন্তু অচেনা লাগল না।
আর্য বুঝতে পারল --
ফোনটা তাকে একা করেনি। কিন্তু সে শুধু আর্যের নীরব সময়গুলো ভরে দিচ্ছিলো।
ফোন না থাকলে, মানুষ মানুষ খুঁজবে। কথা বলবে। সম্পর্কে ভুল করবে --
আবার নতুন করে শুরু করবে।

সেটাই তো মানুষের স্বভাব।
ফোনটা টেবিলে রেখে সে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।
বাইরে শহর তখনও জেগে।

আর্য মনে মনে বলল,
"কাল কাউকে ফোন করব।
কিন্তু শুধু কথা বলার জন্য।"

পিছনে পড়ে থাকা ফোনটা তখনও চুপচাপ।
আর প্রথমবার,
এই নীরবতাটা আর্যের একাকীত্ব বাড়াল না--
বরং জায়গা করে দিল নতুন মানুষের জন্য।

* * * * * *


Drawn by
আবির দাস


রাজদীপ ঘোষ

সরস্বতী

-- পূজা ঘোষাল --

হলুদ শাড়ি আজও আসে
বসন্তের রোদে,
তবে বইয়ের পাতা
মলিন ধুলোয় কাঁদে।

খাতার পাশে এখন ল্যাপটপ,
আর কালির দোয়াত শুকনো।
জ্ঞানের খোঁজে সবাই --
খুঁজি, ওয়াই-ফাইয়ের হটস্পট।

বীণার তারে বাজে সেলফির ক্লিক,
পুষ্পাঞ্জলির আগে
স্টোরি আপডেট ঠিক।

তবু মা, আজও তুমি আছো বসে,
বীণা হাতে,
চড়ে সাদা রাজহাঁসে।

হয়তো আজ প্রণাম একটু তাড়াতাড়ি,
কিন্তু মা বিশ্বাস কমেনি,
কানা-কড়ি।

যেন মা নীরব আশীর্বাদ ঝরে,
অন্তর জুড়ে,
ধীরে ধীরে।

যে শিক্ষা বই দিয়ে শুরু হয়নি

-- গৌতম দাস --

অমিতাভর সাথে ওর স্ত্রীর রোজই ঝগড়া হত। পাড়াপ্রতিবেশীদের বাচ্চাকাচ্চারা সবাই অ-আ-ক-খ - A-b-c-d লিখতে শিখে গেছে, অথচ অমিতাভর ছেলে মৈত্রেয় কিছুই শেখেনি। এমনকী অমিতাভ ওর ছেলের হাতে খড়ি অবধি করতে দেয়নি। স্ত্রী প্রায়ই অভিযোগ করত, "কি গো বাচ্চাটাকে অশিক্ষিত বানিয়ে রাখতে চাও নাকি? ওদিকে ঘোষবাড়ির বাচ্চাটাকে দেখো, এখন যোগ বিয়োগ করতে শিখে গেছে।" অমিতাভ কোনো উত্তর দিতনা, গম্ভীর মুখে খবরের কাগজে মুখ গুঁজে রাখত। স্ত্রী একপ্রকার জোর করেই একজন প্রাইভেট টিউটরকে জোগাড় করে এনেছিল, কিন্তু অমিতাভ তাকে ভাগিয়ে দেয়। অমিতাভর মা বাবাও বুঝতনা ছেলের এমন আচরণের কারণ। তবে অমিতাভর দাদু দিদিমা কিছুটা বুঝতে পারতো তাকে।

অমিতাভ নিজে শিক্ষিত, MBA করার পর পারিবারিক মাছের ব্যবসা দেখাশোনা করে , অথচ নিজের ছেলে মৈত্রেয়-র বেলায় এমন অবহেলা স্বাভাবিকভাবেই সবাইকে আশ্চর্য করত। মৈত্রেয়-র বয়স চার। সে এখনও অ-আ-ক-খ লিখতে শেখেনি, পড়তেও শেখেনি। অমিতাভ যখন মোটামোটা রবীন্দ্র, বঙ্কিম রচনাবলী কিংবা ব্যোমকেশ নিয়ে বসত, তখন ছোট্ট মৈত্রেয় বইয়ের দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকত। অমিতাভ মুচকি হেসে ছেলেকে বলত, “এসব বড়দের বই, ছোটদের পড়ার জিনিস নয়।” বাবা যখন অন্য ঘরে থাকত, ছোট্ট মৈত্রেয় মাঝেমাঝে বাবার বইগুলো খুলে দেখার চেষ্টা করত। অমিতাভ দেখতে পেলে গম্ভীর মুখে বইটা কেড়ে নিত।

ঠিক এই দমবন্ধ করা পরিস্থিতির মধ্যেই একদিন বাড়িতে হাজির হলো এক বিশাল কাঁচের অ্যাকুরিয়াম। নীলচে স্বচ্ছ জলে লাল, নীল আর সোনালি মাছের আনাগোনা। মৈত্রেয় বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইল। জীবনের প্রথম চার বছর যেন সে এক মস্ত রঙিন পৃথিবীর খোঁজ পেল।

প্রথম প্রথম অ্যাকুরিয়ামের কাছে যাওয়ার কড়া নিষেধাজ্ঞা ছিল। অনেক কান্নাকাটি আর অনুনয়ের পর অমিতাভ অনুমতি দিল এক বিশেষ শর্তে—মাছগুলোকে নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট সময়ে খাবার দিতে হবে। মৈত্রেয় সেই দায়িত্ব নিল পেশাদারিত্বের সাথে। বইয়ের পাতার মৃত অক্ষরের চেয়ে জলের তলার এই জীবন্ত প্রাণগুলো তার প্রাণের বন্ধু হয়ে উঠল।

মৈত্রেয় শিখল একাগ্রতা, শিখল সময়ানুবর্তিতা আর মায়া। অমিতাভ আসলে চাইছিল, তার ছেলে আগে প্রাণের স্পন্দন আর প্রকৃতির ভাষা শিখুক, কাগজের কালো অক্ষর তো সারা জীবন পড়ার জন্যই পড়ে আছে।

মাসখানেক বাদে অমিতাভ কিছু বাংলা আর ইংরেজীর ফার্স্ট বুক কিনে ঘরে রাখল। স্ত্রীর ভীষণ উৎসাহ, এবার ছেলে অক্ষর চিনবে, সংখ্যা চিনবে। ঘোষবাড়ির বাচ্চার সাথে মৈত্রেয় কম্পিটিশন দেবে। কিন্তু অমিতাভ কড়াভাবে বউকে বারণ করে দিল, মৈত্রেয়কে যেন ভুলেও হাতেখড়ি করানো না হয়। বইগুলো ঘরেই রাখা থাকত, মৈত্রেয় বইগুলো নিয়ে পরম বিস্ময়ে ঘাঁটাঘাঁটি করত। অজগর সাপ কিংবা আমের ছবির পাশে কি লেখা রয়েছে, তার এক বর্ণও উদ্ধার করতে পারতনা। সেজন্য মৈত্রেয়-র বিস্ময় আরও বাড়ত। সারাদিন বইগুলো নিয়ে পড়ে থাকত আর অক্ষরগুলোর মর্মোৎঘাটনের প্রচেষ্টা করত। একদিন বাবার ড্রয়ার থেকে পেনসিল বের করে নিজে নিজেই অক্ষরগুলো লেখার চেষ্টা করল। বইয়ের ছবিগুলোর পাশেই। অফিস থেকে ঘরে ফিরে অমিতাভ বইটা একবার খুলেই বিস্মিত হয়ে গেল। মৈত্রেয়কে জিজ্ঞেস করল, ‘এগুলো কিভাবে লিখলি? মা শিখিয়েছে?” মৈত্রেয় চোখদুটো নীচু করে উত্তর দিল, “না বাবা আমি লিখেছি। এগুলো কি? আমায় শেখাবে?” অমিতাভ ছেলের মাথায় একবার হাত বুলিয়ে দিয়ে পাশে বসল। সহজ ভাষায় ব্যখ্যা করল, কিভাবে এই অক্ষরগুলোর মাধ্যমে বর্ণ তৈরি হয়। কিভাবে অক্ষরগুলোর মাধ্যমে আমরা মুখে উচ্চারণ করা কথাগুলো কাগজ পেনসিলে ফুটিয়ে তুলি। মৈত্রেয়-র হাতে হাত মিলিয়ে কাগজে ফুটিয়ে তুলল অ-আ-ই-ঈ। মৈত্রেয় পরম বিস্ময়ে শিখতে লাগল।

যেগুলো এতদিন মনেপ্রাণে লিখতে চাইত, সেগুলো আজ বাবার হাতে হাত রেখে শিখছে। পেছনের দেওয়ালে মা সরস্বতীর ছবি, আজ বাবা আর ছেলের অকাল হাতেখড়ির সাক্ষী থাকলেন স্বয়ং দেবীও। মৈত্রেয় একটু বেশি বয়সেই স্কুলে ভর্তি হল। ফাইনাল পরীক্ষায় মৈত্রেয় ফার্স্ট, বাকী বাচ্চাদের থেকে অনেক বেশি নাম্বার পেয়ে পরবর্তী ক্লাসে উত্তীর্ণ হল। বাকী বাচ্চাদের গার্জিয়ানরা আলোচনা করতে লাগল, "বেশি বয়সে ধেড়ে বাচ্চাকে ভর্তি করিয়েছে, ফার্স্ট তো হবেই।" অমিতাভর কানেও এসব কথাবার্তা আসত, সেগুলো শুনে অমিতাভ মুচকি হাসত।

একদিন ঘোষদের ছেলের জন্মদিন ছিল, সপরিবারে অমিতাভ সেই আতিথ্য গ্রহণ করল। নৈশভোজের পরে ঘোষগিন্নি আড়ালে অমিতাভকে জিজ্ঞেস করল, "আপনার ছেলে কদিন আগে অ-আ-ক-খ অবধি লিখতে পারতনা, এখন স্কুলে ফার্স্ট হচ্ছে কিভাবে বলুন তো? শুনতে পাই সারাক্ষণ নাকি বইয়ে মুখ গুঁজে বসে থাকে। আমাদের ছেলেটাকে তো পিটিয়ে পিটিয়েও পড়তে বসাতে পারিনা। সুযোগ পেলেই স্মার্টফোনে গেম খেলা শুরু করে।"

অমিতাভ মুচকি হাসল। বলল, "একটা বাচ্চা জন্মের পরে বোঝেনা কোনটা স্মার্টফোন আর কোনটা পড়ার বই। তাও সে স্মার্টফোনের দিকে আগ্রহবোধ করে কিন্তু পড়ার বই দেখলেই পালিয়ে যায় কেন জানেন?" ঘোষগিন্নি চুপ রইলেন। অমিতাভ বলল, "আপনার ছেলে পড়তে না বসলে আপনি তাকে মারেন। অর্থাৎ পড়াশোনা ওর কাছে এখন ভয়ের জিনিস। ও জানে পড়া মুখস্ত করতে না পারলে মার খেতে হবে, বেশি নম্বর না পেলে বকুনি খেতে হবে। এমনকী বেশিরভাগ বাচ্চা এটাও জানেনা, তাদেরকে কেন জোর করে অ-আ-ক-খ মুখস্ত করানো হয়। সবাই করছে বলে ওরাও করে। মা বাবার বকুনি কিংবা মারের ভয়ে মুখস্ত করে। অথচ বাচ্চারা স্মার্টফোনের দিকে আগ্রহবোধ করে কারণ সেটা ঘাঁটতে আপনারা নিষেধ করেন। নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি আকর্ষণ, প্রতিটা মানুষ এমনকী প্রাণীর ভেতরেও জন্মগতভাবে থাকে। আপনি আপনার ছেলেকে স্মার্টফোন ঘাঁটতে বাধা দেন, আমি আমার মৈত্রেয়কে বই পড়তে বাধা দিতাম। ফলাফলটা আপনার চোখের সামনে।"

ঘোষগিন্নি খানিক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু বই পড়তেই মৈত্রেয় আগ্রহ দেখাল কেন?" অমিতাভ বলল, "কারণ আমি ওর সামনে মোটামোটা বই পড়তাম। বাচ্চারা বড়দের অনুকরণ করতে চায়। সেটায় বাধা দিলে ওদের আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। ঠিক যেমন আপনার ছেলে, আপনাকে আর দত্তদাকে দিবারাত্র স্মার্টফোন ঘাঁটতে দেখে। সেইজন্য ওরও আগ্রহ স্মার্টফোনের দিকেই।" ঘোষগিন্নি তবুও মন থেকে মানতে পারছিলেন না। আরও খানিক্ষণ চুপ থেকে জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু আপনার এই থিওরির ওপর ভিত্তি করে এত বড় রিস্ক নিলেন? মৈত্রেয় নিজে থেকে আগ্রহ না দেখালে তো সারাজীবন অশিক্ষিতই থেকে যেত।"

অমিতাভ আবার মুচকি হেসে উত্তর দিল, "কেউ সারাজীবন অশিক্ষিত থাকেনা। শুধু আপনারাই শিক্ষা শব্দটাকে সঠিকভাবে বিশেষায়িত করতে শিখলেন না। আমি বাড়িতে মৈত্রেয়-র জন্য ব্যাট, হকি স্টিক, ফুটবল, হারমোনিয়াম, আঁকার খাতা সবকিছু কিনে রেখেছিলাম। কোনো একটা জিনিসের প্রতি আগ্রহ দেখাত এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন। যদি ব্যাটের দিকে ওর আগ্রহ থাকত, তাহলে বড় হয়ে ক্রিকেটার হত। হারমোনিয়ামে উৎসাহ পেলে গায়ক হত। আপনারা শিক্ষা বলতে শুধু বই-খাতা বোঝেন, কিন্তু শিক্ষার সংজ্ঞাটা একটু আলাদা। মৈত্রেয় বড় হয়ে কি হবে, এটা ওর সিদ্ধান্ত। আমি শুধু ওকে শিখিয়েছি, কিভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।"

এত সাংঘাতিক থিওরি দত্তগিন্নির পক্ষে হজম করা শক্ত ছিল। আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু মৈত্রেয় যদি স্মার্টফোনের দিকে আগ্রহ দেখাত?"

সূচিপত্র

অমিতাভ বলল, “স্মার্টফোন কি খারাপ জিনিস? আই-ফোনের প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ জবসের রোজগার কত জানেন? যদি মৈত্রেয়র উৎসাহ স্মার্টফোনের দিকেই থাকত, তাহলে ওকে শেখাতাম টেকনোলজির ব্যাপারে। হয়ত মৈত্রেয় বড় হয়ে এমন এক ভারতীয় বাঙালী স্মার্টফোন কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করত, যেটা হয়ত অ্যাপেলকেও টেক্কা দিত। আশা করি আর কোনো প্রশ্ন নেই, চলি দিদি। আজকের রান্নাটা দারুণ ছিল। ধন্যবাদ।”

বছর পনেরো পেরিয়ে গেছে। মৈত্রেয় এখন M.Sc পড়ছে BHU থেকে। মাসখানেক আগে ICAR - Central Inland Fisheries Research তরফ থেকে চিঠি পেয়েছিল, মাছ চাষ সংক্রান্ত ওর একটা প্রোজেক্ট সায়েন্টিস্টদের পছন্দ হয়েছে, তাই একসাথে রিসার্চ করতে চায়। অমিতাভ এখন বেশ মনোরম সময় কাটাচ্ছে। পড়াশোনার সাথে মাছ নিয়ে যে নেশা অমিতাভর মধ্যে দিয়ে তার ছেলের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল, সেই নেশা একদিন দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে বলেই সে আশাবাদী...



সমুদ্র

-- অনুসূয়া বন্দ্যোপাধ্যায় --

সঞ্জয় ছবি তুলতে ভালোবাসে , প্রফেশন নয় শখ বলা যায়। ব্যাঙ্ক এর চাকরির পাশাপাশি ছুটি পেলেই ও ক্যামেরা কাঁধে বেরিয়ে পড়ে। এবার এই গন্তব্য অতি পরিচিত দীঘা।
বাস থেকে নেমেই হোটেল না খুঁজে সোজা সমুদ্রের সামনে চলে এসেছে। বেশ বেলাই হয়ে গেছে, দুপুরের রোদ চড় চড় করছে ,সঞ্জয়ের কালো রং আর কত কালো হবে ,তাই রোদের তোয়াক্কা না করেই সমুদ্রের দিকে এগোলো। লোকের ভিড় সমুদ্র সৈকতে এখনো সেভাবে হয়নি। ফাঁকা সমুদ্র পারের নিজস্ব একটা চরিত্র আছে। দূরে একটা খোলা ছাতা দেখে ,আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলো। একটু ক্লান্ত লাগছে, বসবে ভাবলো। কিছুক্ষন পরেই সূর্যাস্ত হবে ,একটা মেছো নৌকা পেলে ,কয়েকটা সিল্যুট ছবি তুলবে। চারদিকে চোখ ঘোরাতে ঘোরাতেই চোখ আটকে গেলো। ওটা কি !আর এগোতে পারছেনা ,পাগুলো যেন আটকে গেছে ,শেষপর্যন্ত মনে জোর এনে ৩৫০ টেলি টা ফোকাস করলো। একটা ছোট্ট পা বালির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আছে। নিশ্চয় খেলতে খেলতে কোন বাচ্চা জলে চলে গেছিলো। কোনখান থেকে ভেসে এসেছে ,মা বাবা খুঁজে মরছে। একটু একটু করে এগোলো সঞ্জয় ,চমকে উঠলো ,এ কি !বাচ্চা নয় ,পূর্ণ বয়েস্ক একটি মেয়ে। চোখ গুলো বড্ডো বড় ,ছোট করে চুল ছাঁটা ,বেশ স্বাস্থ্য ভালো ,জলে ভিজে লাল কুর্তি গায়ে আটকে গেছে। অসম্ভব ফর্সা মুখে যন্ত্রণা র সঙ্গে কি বিস্ময় ,যেন ভাবতেই পারছেনা ,এটা হতে পারে।
কি করবে বুঝতে না পারলেও যান্ত্রিক ভাবে বেশ কয়েকটা ছবি পরপর তুলে ফেললো সঞ্জয়।
রোদ পড়ে আসছে ,মৃতদেহ ঘিরে লোক জমতে শুরু করছে। আর থাকতে ইচ্ছা করলোনা। লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করলো। প্রায় চল্লিশ মিনিট হেঁটে যাবার পর মনে হলো কোথায় চলেছে ও ! গরমের দিন বলে , এখনো অন্ধকার হয়নি ,কিন্তু সন্ধ্যা নেমে এসেছে। প্রায় ছটা বাজে ,বাস থেকে নামার পর কিছু খাওয়া হয়নি। এক কাপ চা খেলে মন্দ হয়না। চারপাশ তাকিয়ে একটা ছোট্ট চায়ের ঠেলা গাড়ি দেখতে পেলো। গাড়ির সামনে থেবড়ে বসে আছেন এক বছর ৭০ এর মহিলা। সর্বশান্ত, সর্বহারা এক মানুষ। পোশাক বেশ সম্ভ্রান্ত ,বড় বড় চোখ ,ধবধবে ফর্সা রং ,সাদা আর নীলের কটকী শাড়ি কোনোরকমে গায়ে জড়ানো , নাকে একটা হীরের নাকছাবি চকচক করছে। কোনো হুস নেই ,সঞ্জয় চায়ের কাপ নিয়ে ,চাওয়ালার দিকে তাকালো ,সেও যেন কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে স্থানুর মতন দাঁড়িয়ে গেছে। চা খাওয়ার বেশ কিছুক্ষন পর আরো এক কাপ চা আর বিস্কুট খেয়ে , ব্যাগ ঠিক করতে করতে সঞ্জয় ছেলেটির সঙ্গে চোখে চোখে সব প্রশ্ন ছুড়ে দিলো। চোখে ছেলেটিরও হাজার প্রশ্ন, সেও বুঝতে পারছেনা মহিলার এভাবে বসে থাকার রহস্য।

দূর থেকে একটা পুলিশের গাড়ি আসছে ,ওদের সামনেই দাঁড়ালো। মহিলা এতক্ষনে চোখ তুলে তাকালেন। এতক্ষন যে ওরা ওঁর সামনে ছিল , সে নিয়ে কোনো উত্তাপ ই নেই। পাথরের মতন সোজা এগিয়ে গিয়ে পুলিশ এর হাতধরে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। কৌতূহল ছিলই ,এবার একটু বেশি হল , তবুও কিছু না বলে সঞ্জয় চায়ের দাম মিটিয়ে হাঁটা দিলো হোটেলের খোঁজে। খুব পরিচিত জায়গা ,বেশি সময় লাগলো না, একটা পছন্দ সই ঘর পেতে। স্নান করে বেশ আরাম লাগছে।সারাদিন যে কিছু খাওয়া হয়নি ,পেট যেন এখন সময় পেলো সে কথা জানাতে। উফফ কি খিদেটাই পেয়েছে, দরজায় তালা লাগিয়ে খাওয়ার হোটেলের খোঁজে বেরিয়ে পড়লো। কিছুটা গিয়েই দাদাবৌদির ভাতের হোটেল ,ভাত মাছের ঝোল সবাই বেশ তৃপ্তি করে খাচ্ছে। অর্ডার দিয়ে চারপাশে চোখ বোলাতে ,নজরে পড়লো সবাই ,ওই মৃতদেহ নিয়েই কথা বলছে। চোখে আবার সেই ছবি ভেসে উঠলো,এতো খিদে কিন্তু খাওয়ার ইচ্ছাটাই উড়ে গেলো। কোনোরকমে কিছুটা খেয়ে উঠে পড়লো। একটা সিগারেট খেতে হবে ,মাথাটা ধরে গেছে। সামনের পানের দোকানেই সিগারেট কিনে ধরাতে ধরাতে ,কানে এলো ফিসফাস গুজগুজ ,যেটুকু জানতে পারলো ,সেটা শুধু মনখারাপ করে দেওয়া আধুনিক পৃথিবীর অসহায় মা বাবার গল্প।

চট করে শান্তিপুরের নিজেদের পুরানো রংচটা বাড়ি আর মায়ের মুখটা ভেসে উঠলো। নতুন কিছু নয়,তবে শেষটা এমন না হলেই ভালো হতো। অসহায়তা মানুষকে যেন এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য না করে। মহিলার স্বামী গতবছর মারা গেছেন। ছেলে   উচ্চশিক্ষিত সুচাকুরে। স্বাভাবিকভাবেই দেশে না থেকে বিদেশে গেছে। ছেলে বৌ নিয়ে সুন্দর সাজানো সংসার। দেশে বছরে একবার এসে মা বাবার প্রতি কর্তব্য সেরে যায়। গতবছর মহিলার স্বামী মারা গেছেন .ছেলে আসতে পারেনি। স্বামীর কাজ বৃদ্ধা কেই করতে হয়েছে । সেটা বেশ বড়   ধাক্কা ,মহিলা সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন ,স্বামীও বড় চাকুরে ,টাকাপয়সার অভাব নেই ,যার অভাব তাহলো লোকবল। বছর চল্লিশের অবিবাহিত মেয়ে ,কে তার দায়িত্ব নেবে ? শুধু যে বয়েস আর অবিবাহিত তাতো নয়,মেয়ে যে আর দশজনের মতন নয়। ৪ ফুট উচ্চতার মেয়ে ওজন ৬০ কেজি ,হাঁটাচলা বেশি করতে পারেনা। দেহের তুলনায় পা গুলো সরু সরু, হারের অবস্থা ভয়ঙ্কর খারাপ, মেয়ে যে বামুন। ছেলেকে বলেছিলো,ছেলে- বৌমা সোজা অস্বীকার করেছে ,বলেছে ‘ তুমি না থাকলে আশ্রমে দিয়ে দেব । আমাদের ওর দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয় ।’ হার্টের রোগী মায়ের আগেই দুবার হার্ট অ্যাটাক হয়েগেছে। স্বামী যতদিন ছিল এক রকম ভরসা ছিল কিন্তু স্বামী চলে যাবার পর ছেলের এই ব্যবহার বৃদ্ধা নিতে পারেন নি। শুধু ভেবেছেন ,আজ যেমন স্বামী চলে গেলেন , কাল তিনি যখন চলে যাবেন কি হবে তার অসহায় মেয়ের। তাই সহজ সিদ্ধান্ত ,দীঘা আর দীঘার সমুদ্র। ভরদুপুরে ফাঁকা সমুদ্রে অনেচ্ছুক মেয়েকে জোর করে জলে নামিয়ে ছিলেন। নিজে জল থেকে উঠে গেলেও মেয়ে কোথায় ভেসে গেলো , দাঁড়িয়ে শুধু দেখেছেন , কিন্তু একপাও আর এগিয়ে মেয়েকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন নি । তারপর ওই জায়াগা ছেরে এক পাও আর এগতে পারেননি , ধপ করে ওখানেই বসে পড়েছিলেন।

কি জানি কেন ,কিছুটা ইচ্ছায় কিছুটা অনিচ্ছায় ছবিগুলো প্রিন্ট করালো সঞ্জয় । পরেরদিন সকালেই বেরিয়ে পরা । অনেক কিছু মনে হচ্ছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছবির প্রিন্ট গুলো নিয়ে থানার দিকেই রওয়ানা দিলো । গিয়ে দেখল মহিলাকে ছাড়াতে কেউ আসেনি, থানার ভিতর   দূরের একটা চেয়ারে   সেই সমুদ্রতীরের মতন ভাবলেশ শূন্য হয়ে বসে আছেন মহিলা। এক ফোঁটা জল ও বোধহয় সকাল থেকে মুখে দেননি। সামনে চায়ের গ্লাস পরে আছে।

ছবিগুলো থানার বড়বাবুর হাতে তুলে দিতে উনি বললেন এগুলোর কোনো দরকার নেই , কেস জলের মতন পরিষ্কার । হঠাৎ   ছুটে এসে ভদ্রমহিলা ছবিগুলো বড়ো বাবুর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন , ঝিনুক এ আমি কি করলাম !

* * * * *

সূচিপত্র

আমি

-- রেখা দাস --

অনির্বাণের চিঠিটা পেতেই পুরাতন সব কথা মনে পরে গেল। অনির্বাণ আর নিখিল আমার স্কুল থেকে কলেজ জীবনের বন্ধু। কলেজের তিন বছরই ওরা দুজনে আমার খুব কাছের ছিল, আমাদের বন্ধুত্বটা সাধারনের থেকে একটু বেশিই গভীর ছিল। আমি গীটার বাজাতে ভালবাসতাম। নিখল খুব সুন্দর রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইত। অনির্বাণও মাঝে মধ্যে নিখল এর সঙ্গে গলা মেলাতো। আর সেই জন্যই, এই বন্ধুতটা যে কলেজে একটু পপুলার ছিল তা বললেও ভুল হয়না। অনির্বাণ বেশ ধনী ফ্যামিলির ছেলে, তার বাবা বেশ বড় ব্যাবসার মালিক। আমি একজন স্কুল শিক্ষকের ছেলে। নিখিলের বাড়ি ছিল গ্রামে। তার বাবা খুব সাধারন চাষি বলেই জানতাম। কিন্তু এই সবে আমাদের বন্ধুত্বে কখনও কোন বাধা ফেলেনি।

আমাদের মধ্যে আরও একটা মিল ছিল। স্কুল লাইফ থেকেই আমাদের মাথায় সমাজ সংস্কারের ভূত চেপেছিল। কিন্তু কেমন করে তা কাজে পরিনত করা যায় কলেজে আসার আগে তার ধারনা ঠিক স্পষ্ট ছিল না। কলেজে এসে কলেজ-পলিটিক্স এর পান্ডা অমলেন্দু-এর সংস্পর্শে এসে সেটা প্রবল হয়ে ওঠে আমাদের মধ্যে।

কলেজের পড়া শেষ করে যে যার ভবিষ্যৎ জীবনে ফিরে যাবার আগে আমারা তিনজন শেষ বার মিলিত হই কফি হাউসে। সেই দিন আমরা ঠিক করেছিলাম যে জীবনে যে যাই করি, দশ বছর পর আবার আমরা কফি হাউসেই মিলিত হোব... আর আজ সেই দিন। এই দিনটাকেই আমি ভুলে যাচ্ছিলাম কি করে! হঠাৎ করে চিঠিটা পেতেই পুরাতন কথা মনে পড়ে গেল, আর মনটা খুশিতে ভরে উঠল বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে মনে করে। অনির্বাণ তো ঠিকই মনে রেখেছে। আর খুঁজে নিয়ে আমাকে একটা চিঠিও দিয়েছে। নিখিল এর এই দিনটার কথা মনে আছে কি?

# # # # #

ঠিক সন্ধে ছয়টায় আমি কফি হাউসে এসেই আমাদের নিদিষ্ট টেবিলে চেয়ে দেখলাম। সেখানে নতুনের ভিড়। আমার চোখ চারিদিকে খুঁজে ফিরতে থাকল নিখিল, অনির্বাণকে। চোখ আটকে গেল কোনের দিকে একটি টেবিলে। অদ্ভুত উজ্জ্বল দুটো চোখ ততক্ষনে আমাকে খুঁজে নিয়েছে। সে আমাকে ডাক দিলো হাত তুলে। আমিও নিখিলকে খুঁজে পেলাম। সাধারন পোষাক। কিন্তু সেই সপ্রতিভ নিখিল। আমি দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে বললাম – 'কেমন আছ?'' নিখিল মধুর হেসে বলল – 'ভাল। তোমার কি খবর বল।'' আমি মনে মনে চমকে উঠলাম। মনে পড়ে গেল সেই শেষের কফি হাউসে কাটানো দিনটা। সেইদিন যে আমরা শুধু মিলিত হব সেটাই ঠিক হয়নি... আসলে আমরা যখন আড্ডা দিতাম আমাদের বিষয় কেমন করে শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়াত 'social justice', 'politics' এই সবের মধ্যে। সেই দিনও এর ব্যতিক্রম হয়নি। আর সে দিনের সেই আড্ডার শেষ হয়েছিল একটি শপথ দিয়ে - যে জীবন যাকে যেখানেই নিয়ে যাক, দেশ সমাজের প্রতি নিজের দায়িত্ব ভুলে যাব না। দশ বছর পর আবার মিলিত হয়ে একে অপরের অভিঞ্জতা শেয়ার করব।

আমার কিছু বলার আগেই, নিখিল চিৎকার করে ডাক দিল – 'অনির্বাণ এধারে।' আমিও চোখ তুলে দেখলাম সস্ত্রীক অনির্বাণ হাসি মুখে এগিয়ে আসছে। দুজন কে পাশাপাশি খুব ভাল মানিয়েছে। মনে পড়ে গেল অনির্বাণ মানিব্যাগে লাবন্য বলে একটি মেয়ের ফটো নিয়ে ঘুরতো, ইনি কি সেই লাবন্য? বলত বিয়ে যদি করি তবে লাবন্যকেই করব। তাতে অনির্বাণ এর সমস্যা বিশেষ কিছু ছিলনা, কারন তার ভবিষ্যৎ চিন্তা ছিলনা।

সে অস্বীকার করলেও আমরা মনে মনে জানতাম তাদের বিরাট ব্যাবসা একদিন তাকেই সামলাতে হবে। আসল সমস্যা ছিল লাবন্য বাল্য বিধবা। তার ওপর তার মা বাড়ি বাড়ি কাজ করে তাকে মানুষ করেছে। তাই অনির্বাণ এর পরিবার থেকে লাবন্য কে মেনে নিত না। অনির্বাণ বলত বিয়ে যদি করতে হয় তবে তাকেই করবে। তাতে যদি তার বাবা তাকে ত্যজ্যপুত্র করে তো করুক।

অনির্বাণ কাছে এসে আমাদের সাথে লাবন্যর পরিচয় করিয়ে আমার সংশয় এর আবসন করল আর আমাদের দিকে ছোট্ট একটা হাসি দিয়ে তার জয় এর জানান দিল। তার পর আমার দিকে তাকিয়ে বলল- 'কিন্তু তুমি একা কেন বন্ধু, কথা ছিল প্রিয়াদের সঙ্গে নিয়ে মিলিত হব। মালতীকে আনলেনা কেন?' আমি নিখিলের দিকে তাকিয়ে না থাকলেও বুঝতে পারলাম নিখিল চমকে আমার দিকে তাকাল। মালতী আমাদের কলেজ সহপাঠী, একদিন নিখিলকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল সে। আমি একটু অপ্রস্তুত বুঝেই হয়তো অনির্বাণ কথা ঘুরিয়ে অন্য প্রসঙ্গে যাবার চেষ্টা করলো। 'মালতী যে তোমাদের বিয়ের কার্ড পাঠিয়েছিল। তোমাদের তো বিয়ের পরেই বিদেশ যাবার কথা ছিল। আমি কিন্তু গিয়ে উঠতে পারিনি তোদের বিয়েতে, ক্ষমা প্রাথনীয়।' আমি বললাম -'ক্ষমাতো মালতীর কাছে প্রাথনীয়, ক্ষমাতো আমার চাওয়ার কথা তোদের নেমন্তন্ন করে উঠতে পারিনি বলে।'

নিখিল কি অপ্রস্তুত? সেটা বুঝে উঠতে পারলাম না। অনির্বাণ এর দিকে তাকিয়ে সে বলল -'সত্যি তোমার তো তবু আজকের দিনের কথা মনেছিল। আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। আর সম্ভ্রিক এখনও হয়ে উঠতে পারিনি, অনেক খেটে একটা NGO তৈরি করে কাজ করে চলেছি গ্রামে গ্রামে...' কথার মাঝেই অনির্বাণ বলল –'এই ক্রেডিটটা কিন্তু আমার ম্যাডাম এর পাওয়ার কথা। দেখা করার কথাটা আমিই লাবন্য বলেছিলাম অনেকদিন আগে কিন্তু দিনটা যে আজ সেটা মনে ছিল না। আসলে লাবন্যর তোমাদের দুজকেই দেখার খুব ইচ্ছা ছিল। তোমাদের দুজকেই প্রথমে বলেনিই সমাজ সেবার দায়িত্বটা আমি লাবন্যর ওপর দিয়ে শুধুই ব্যবসার কাজে নিযুক্ত।'

লাবন্য তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, তা নয় আমি যেটুকু করতে পেরেছি সবই ওর সাহায্যে। আর নিখিল বাবু আপনার NGO এর সাথে আমরাও কাজ করতে চাইব কিন্তু।

আমি বললাম –'নিজের কাজটা সঠিক ভাবে করাটাও কি দেশের কাজ নয় আমি কিন্তু নিজের কাজ খুব মনোযোগ দিয়ে এ করে থাকি।'

লাবণ্য বলল –'নিশ্চয়, কিন্তু সেটাকে কি আপনি আজ যথেষ্ট বলে মনে করেন?'

আমি বললাম –'কেন নয়?'

উত্তরটা এলো নিখিলের থেকে –'একদিন এই কফি হাউসে বসে অনির্বাণকে তুমিই বলেছিলে – "আমাদের সমাজময় এত কৃত মানুষ, সে ব্যবসাজীবি হোক বা চাকরি বা অন্য যা কিছু হোক, তারা সকলে চেস্টা করলে এই দেশের সকল সমস্যা পাঁচ বছরে শেষ হতে পারে। কিন্তু তাদের মধ্যে সেই উদ্দেশ্য নেই। যেমন ধর একজন সরকারি কর্মচারী, সে তার কাজের মাধ্যমে দেশকে contribute করছে মানছি, কিন্তু সে কি কাজটা দেশকে contribute করার জন্য কাজ করছে? নাকি জিবিকা নিবাহের জন্য..." আমরাও তো সেইদিন নিজের মধ্যে সেই বড় উদ্দেশ্যটাকে নিজেদের কাজে ধরে রাখারই শপথ করেছিলাম, আর সেই জন্যই না আজ দেখা করার কথা ছিল বন্ধু...'

কালো কফি এসেছে। সবার ঠোঁট এলোমেলো কফির পেয়ালায়। কথা চলছে এলোমেলো। কফি আর সিগারেটের ধোঁয়া ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ছে। ...সবাই সমস্বরে কলরব করে উঠলো।

চারপাশে ধোঁয়াশার সাথে মিশে গেছে কলস্বর। সৃষ্টি হয়েছে অপরূপ এক কলরব। ক্রমশ তা আমাদের গ্রাশ করতে চাইছে...

# # # # #

সেই কলরব থেমে গেছে। একে একে নিখিল ও আনিরবান-লাবন্য বিদায় জানিয়ে চলে গেছে। আমার মনের রং এখন ঘন ধূপছায়া। ধূ ধূ বালুচর। ভেঙ্গে খান খান হচ্ছে অজস্র অগনন ঢেউ। ধীরে ধীরে আলো কমে আসছে। ঝাউবন ভেদকরা একটা শাঁ শাঁ শব্দ। তীরে আঘাত করে কোথায় যেন ছড়িয়ে পড়ছে – দূরে আরও দূরে। মন ভেসে চলে রামধনুর পারে। শূন্যে গভীর শূন্যের পানে। কাছে কোথায় যেন বাজছে – টুং-টাং, টুং-টাং, টুং-টাং...

“ এমন একান্ত করে পাওয়া
এও সত্য যত,
এমন একান্ত করে ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মতো।
এ দুয়ের মাঝে তবু আছে কোন মিল-
নহিলে নিখিল-
এতো বড়ো নিদারুন প্রবঞ্চনা
এতোকাল হাসিমুখে
কিছুতে বহিতে পারিত না।
তার সব আলো-
কীটে-কাটা পুষ্পসম
হয়ে যেত কালো। ”

- সামনে দাঁড়িয়ে একটা আবছায়া। আলখাল্লা। চাপদাড়ি। হাতে নকশা-কাটা থালা। গোল কি চৌকো বোঝা যাচ্ছে না। অবশ দেহ। অবসন্ন মন। - ‘বাবু’- শব্দে চোখ মেলে দেখি চাপরাশি। সামনে দাঁড়িয়ে। কফি হাউসের সব আলো প্রায় নিভে এসেছে। আমি এখন একা। একা আমি। কানে অবিরাম বেজে চলেছে- ‘টুং-টাং, টুং-টাং, টুং-টাং...’

# # # # #

Sayzz Journal

এর এই সংখ্যাটি পড়ার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।
আপনার মতামত ও পরামর্শ আমাদের পরবর্তী সংখ্যাগুলোকে আরও সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে তুলতে সহায়তা করবে।

আপনার মূল্যবান ফিডব্যাক জানান এখানে :-

🔗 https://sayzz.com/support/contactus.php

ইমেইল করুন :-

inbox.sayzz@gmail.com

আমাদের আসন্ন সংখ্যার জন্য আমরা খুঁজছি—ফটোগ্রাফি, আঁকা, ছবি, গল্প, প্রবন্ধসহ সব ধরনের সৃজনশীল কাজ। আপনার সৃষ্টিগুলি পাঠিয়ে দিন, আর পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের সুযোগ পেতে আজই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন।

আপনার প্রতিভাই আমাদের আগামী দিনের সৃজনশীল যাত্রার অনুপ্রেরণা।

